আদাবু তালিবুল ইলম ৯ম দারস

বিষয়বস্তু
(তলিবুল ইলমের আদবসমূহ)
• মতভেদপূর্ণ মাসআলায় অন্তর প্রসারিত করা।

মতভেদের সূচনাঃ
যখন কোন বিষয়ে কুরআন এবং হাদিসের কোনো অকাট্য নস (Text) পাওয়া যায় না, তখনই মূলত মতভেদের সূচনা হয়। কারণ যেসব বিষয়ে কুরআন এবং হাদিসের অকাট্য (কেবলমাত্র একটি অর্থ সম্ভব) দলিল পাওয়া যায়, সেসকল ক্ষেত্রে সাধারণত কোনো মতভেদ হয় না। আর যেসকল ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের অকাট্য দলিল অনুপস্থিত, সেই সকল ক্ষেত্রেই মতভেদের সৃষ্টি হয়।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় যখন সাহাবায়ে কেরাম এমন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেন, যে পরিস্থিতির কোনো সমাধান তাদের জানা নেই, তখন তারা খুব সহজেই সেই বিষয়ের সমাধান পেয়ে যেতেন আল্লাহর রাসূল ﷺ এর কাছে। কারণ, যেকোনও বিষয়ের মাসআলা তাঁরা আল্লাহ'র রাসূল ﷺ এর কাছে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ সেটা রাসূল সাঃ কে অহী করে জানিয়ে দিতেন। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনে বলেছেন, **"রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রবৃত্তির বশে কোনো কথা বলেন না, তিনি শুধু সেটাই বলেন যা তার কাছে ওহী পাঠানো হয়" (সূরা নজম, ৫৩:৩-৪)**

কখনও কখনও আল্লাহ'র রসুল ﷺ নিজেও ইজতিহাদ করার চেষ্টা করেছেন এবং তার ইজতিহাদ যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা সেটাকে অনুমোদন করেছেন। আর যদি সেটা ভুল হয়ে থাকে, তখন সেই ভুল ইজতিহাদকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা সংশোধন করে দিয়েছেন। কেউ যদি এই আক্বীদা রাখে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ এর ভুল ইজতিহাদকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা সংশোধন করেননি, তাহলে মূলত সে এটাই বুঝালো যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা এই দ্বীনকে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দেননি।

এর একটি উদাহরণ হলোঃ বদর যুদ্ধে যখন যুদ্ধবন্দীদের কী করা হবে এটা নিয়ে ইখতিলাফ হচ্ছিল, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং আবু বকর (রাযি) এর অভিমত ছিল যে, এদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হোক এবং তাঁরা সেটাই করেছিল। কিন্তু উমার রাঃ এর মত ছিল বন্দীদের হত্যা করতে হবে।
তখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা ওহী নাজিল করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাদের এই কাজটা সঠিক হয়নি এবং এই বিষয়টার জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা এতো বেশি নাখোশ হয়েছিলেন যে, তিনি বলেছেন, যদি আগে থেকে নির্ধারিত না থাকতো, তাহলে এর জন্য আল্লাহর আযাব নেমে আসত।
এই ঘটনা দ্বারা দেখা যায়, আল্লাহর রাসূল ﷺ এখানে ইজতিহাদে ভুল করেছেন এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা সেটা সংশোধন করে দিয়েছেন।

আরেকটি ঘটনায় দেখা যায় আল্লাহ'র রাসূল মদিনায় আসার পর দেখলেন মদিনার খেজুর চাষীরা এক গাছের খেজুরের ছড়া থেকে কিছু একটা কেটে আরেক গাছে লাগিয়ে দেয়, এতে নাকি ফলন ভালো হয়। আল্লাহ্'র রাসূল বললেন, এখন থেকে এটা কোরো না। তখন দেখা গেল অন্যান্য বছরের তুলনায়কে জানালো যে এখন তারা কী করতে পারেন। তখন আল্লাহ'র রসুল ﷺ তাদের বললেন, দুনিয়ার এই সকল বিষয়ে তোমরা আমার থেকে ভালো জানো। তাই তোমরা তোমাদের মতো করতে পারে।
অর্থাৎ, এখানে আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে বলেননি, যদি ওহীর আলোকে বলতেন, তাহলে নিশ্চয়ই এই বিষয় নিয়ে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হতো না। এখানে আল্লাহ্'র রাসূল ইজতিহাদ করেছিলেন। এটি একটি দুনিয়াবি বিষয়ে ইজতিহাদ ছিল কিন্তু যখন তিনি ধর্মীয় বিষয়ে কোনো ইজতিহাদ করেছেন তখন আল্লাহ হয় সঠিক ইজতিহাদ অনুমোদন করেছেন নাহয় যেটা ভুল ইজতিহাদ করেছেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা সেটার সঠিকটা কি হওয়া উচিত ছিল সেটা বলে দিয়েছেন।

আল্লাহ্'র রসুল ﷺ সাহাবীদেরকেও ট্রেনিং দিয়েছেন ইজতিহাদ করার জন্য

বিভিন্ন ইস্যুতে, বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ দুনিয়াবি বিষয়ে সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করতেন এবং সাহাবীরাও বিভিন্ন সময় ভুল ইজতিহাদ করলে তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। বলা যেতে পারে, রাসূল সাঃ এর ইন্তিকালের পরবর্তী সময়ে এটা ছিল সাহাবীদের জন্য একটা অনুশীলন।
সাহাবায়ে কেরামগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর থেকে আজ অবদি ইজতিহাদ ঠিকই রয়ে গেছে, কিন্তু সেই ইজতিহাদের যে একটা ঐশী অনুমোদন বা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার পক্ষ থেকে এটার জন্য যে সংশোধন বা পরিবর্তন তা এরপর থেকে আর সম্ভব হয়নি। কারণ যখন থেকে ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে তখন থেকে এই ইজতিহাদ করে যে সিদ্ধান্তে আসা হয়, তা চূড়ান্ত ভাবে সঠিক না ভুল কিংবা কোনটা সঠিক তা আর নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি এবং তখন থেকেই ইখতিলাফ (মতভেদ) এর সূচনা হয়েছে।

পরবর্তী যুগের তাবেঈদের, তাবে-তাবেঈনদের দ্বারা বা পরবর্তী যুগের এবং বর্তমান যুগের আলেম ওলামাদের দ্বারা কেন ইজতেহাদের মতভেদ হচ্ছে:

একটা খুব কমন প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন- একই মাসআলা একেক জন একেক ভাবে অভিমত দিচ্ছেন কেন? মতভেদপূর্ণ মাসআলায় আমরা অন্তর প্রসারিত করতে পারবো না যতক্ষণ না আমরা নিশ্চিত হবো যে, কেন আসলে মতভেদটা হচ্ছে। মতভদের কারণ যদি আমাদের কাছে স্পষ্ট না থাকে, তাহলে আমাদের মন প্রশস্ত হবে না। এজন্য আগে কারণটা জেনে নেওয়া দরকার যে, আলেমদের মধ্যে কেন মতভেদ হয়!

প্রথম কারণ : রাসূল ﷺ এর হাদিস জানা থাকা এবং জানা না থাকা।

সাহাবায়ে কেরামের কারো কারো কোনো একটা বিষয়ে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর বক্তব্য জানা ছিল এবং তিনি রসুল ﷺ এর বক্তব্য অনুযায়ী ফয়সালা দিয়েছেন। আরেকজন সাহাবীর কাছে এই সংক্রান্ত আল্লাহ'র রাসূল ﷺ এর হাদিস জানা ছিল না। তখন তিনি তার ব্যক্তিগত বুঝের আলোকে ইজতিহাদ করতেন। তখন দেখা যেত তার এই ইজতিহাদ আল্লাহ্'র রসূলের হাদিসের মতো হয়ে যেতো, অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল ﷺ হাদিসে যে বিধান দিয়েছেন, তার এই ইজতিহাদ হাদিসের সেই বিধানের সাথে মিলে যেত। আবার কখনও এমন হতো, কোনো একটা মাসআলার ব্যাপারে দুইজন সাহাবীর মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা হতো

এবং এই আলোচনার মাধ্যমে যদি রাসূল ﷺ এর কোনো হাদিস চলে আসতো, তখন সাহাবীদ্বয় ইজতিহাদ বাদ দিয়ে হাদিসটিকে গ্রহণ করতেন। এই একই কর্মপন্থা সাহাবীদের পরবর্তী যুগেও সালফে সালেহিনদের সময়ে বহাল ছিল এবং একই কারণেই আলিমগণের মধ্যে মতভেদও বজায় ছিল।

যেমনঃ আবু হুরায়রা (রাযি), তিনি মনে করতেন, যে ব্যক্তির উপরে গোসল ফরয হয়েছে। সে যদি সূর্যোদয়ের পূর্বেই গোসল না করে, তাহলে তার রোজা হবে না। কিন্তু যখন আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর স্ত্রীদের থেকে হাদিস পাওয়া গেল যে, রাসূল ﷺ এর আমল এই মতের বিপরীত ছিল। অর্থাৎ, কখনও কখনও রাসূল ﷺ রমজান মাসে সূর্যোদয়ের পরে ফরয গোসল করেছেন। তখন আবু হুরায়রা (রাযি) তার এই আগের মতটা ছেড়ে দিলেন।
আবার, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি) এর কাছে এক মহিলা এসে মোহরের বিধানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো যে, ঐ নারীর মোহরানা কি হবে, যার স্বামী তার মোহরানা নির্ধারণই করেনি এবং তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন।
তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি) বললেন, এই বিষয়ে আল্লাহ্'র রসূলের কোনো ফয়সালা আমার জানা নাই। কিন্তু মানুষজন এই বিষয়ে একটা ফয়সালা দেয়ার জন্য তাকে যখন খুব পীড়াপীড়ি শুরু করে, তখন তিনি একটা ব্যক্তিগত ইজতিহাদ করলেন যে, ঐ মহিলাকে এমন পরিমাণ মোহর দিতে হবে, যেটা তার সম-মর্যাদার মহিলারা পেয়ে থাকে। এর চাইতে কমও না, বেশিও না। এরপর মহিলাটির ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে এবং তার স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারী লাভ করবে।

এই ফয়সালাটা শুনে মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের গোত্রের জনৈক মহিলার ব্যাপারে ঠিক অনুরূপ ফয়সালাই প্রদান করেছিলেন। এই কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি) অত্যন্ত খুশি হয়ে গেলেন, এতটাই খুশি হলেন যে, তিনি ইসলাম কবুল করার পর থেকে এখন পর্যন্ত হননি, যে তার একটা ইজতিহাদ আল্লাহ্'র রসূলের হাদিসের সাথে মিলে গিয়েছে।

• দ্বিতীয় কারণঃ
রাসূল সাঃ এর কাজের ধরণ নির্ণয়ে মতপার্থক্য।

কখনও এমন হতো, কোনো একটা মাসআলার ব্যাপারে দুইজন সাহাবীর মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা হতো এবং এই আলোচনার মাধ্যমে যদি রাসূল ﷺ এর কোনো হাদিস চলে আসতো, তখন সাহাবীদ্বয় ইজতিহাদ বাদ দিয়ে হাদিসটিকে গ্রহণ করতেন।

যেমমঃ হজ্জের আমলগুলোর মধ্যে কাবাঘর তাওয়াফের সময় রমল (প্রথম তিনপাকে একটু দ্রুত হাঁটা) করা। হুদায়বিয়ার পরের বছর, যখন মুসলিমরা হজ্জ করতে গেল, তখন কুরাইশরা বলাবলি করছিল, 'দেখ, মদিনার জ্বর এদেরকে কাবু করে দিয়েছে, এরা দুর্বল হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ'র রাসূল সাহাবীদেরকে বললেন, 'তোমরা প্রথম তিন চক্কর দেয়ার সময় জোরে হাঁটো, যাতে কুরাইশরা দেখে যে তোমাদেরকে মদিনা কাবু করতে পারেনি। এজন্য প্রথম তিন চক্করে জোরে হাঁটা আমাদের জন্য সুন্নত।

কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি) এর মতে , রাসূল ﷺ যে রমল করতে বলেছিলেন এটা একটা সাময়িক ব্যাপার ছিল। তাই তার মতে সমস্ত হজ্জে এটা করা সুন্নত না। কিন্তু পরবর্তীতে অন্যান্য আলেম ও স্কলারদের অভিমত ছিল যে, যেহেতু আল্লাহ্'র রাসূল এটা করতে বলেছেন তাই এটা করাই সুন্নত। এভাবে রাসূল সাঃ এর নির্দেশনা থেকে কাজের ধরণ নির্ণয়ে (ফরয/সুন্নাত/মুস্তাহাব/মুবাহ্) মতপার্থক্যের কারণে আলিমগণের মাঝে মতভেদ হয়েছে।

• তৃতীয় কারণঃ
ধারণাগত বিশ্লেষণের পার্থক্য।
যেমন- আল্লাহ্'র রসূলের হজ্জের বর্ণনা দিতে গিয়ে কোনো কোনো সাহাবী বলেছেন , তিনি হজ্জে তামাত্তু করেছেন। আবার কোনো সাহাবী বলেছেন, তিনি হজ্জে কিরান করেছেন। আবার কারো কারো মতে তিনি হজ্জে ইফরাদ করেছেন। এক্ষেত্রে যারা বর্ণনা করেছে, সবাই আল্লাহর রসূলের হজ্জ দেখেছেন, কিন্তু হজ্জের ধরনটা কেমন ছিল এটার মত নির্ণয় করতে গিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়ে গিয়েছে।

অনেক সময় ইজতিহাদকারী সাহাবীদের নিকট আল্লাহ্ 'র রসূলের হাদিস পৌঁছেছে কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য পন্থায় পৌঁছায়নি। বিশেষ করে সাহাবীদের পরবর্তী যুগে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে পরবর্তী যুগগুলোতে যখন মাযহাবের বিকাশ শুরু হলো , তখন আল্লাহর রসুলের হাদিস তাদের কাছে পৌঁছেছে কিন্তু তাঁদের কাছে সহীহ হাদীস গ্রহণের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ না হওয়ায় অনেক সময় তাঁরা নিজের মতের উপর কিয়াস করেছিলেন। যেমন- আবু হানিফা রাযি এর কাছে হাদীস গ্রহণের শর্ত ছিল হাদীসটিকে সহীহ হওয়ার সাথে সাথে মাশহুর (প্রসিদ্ধ) হতে হবে। কারণ, ঐ সময় ইরাক থেকে হাদীস জালকারীদের উদ্ভব হয় এবং প্রচুর জাল হাদীস তৈরী হচ্ছিল ইরাকে। তাই সচেতনভাবেই কেবলমাত্র বিশুদ্ধ হাদীসের উপর রায় দেওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফা সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। এজন্য বেশ কিছু সহীহ হাদীসের সাথে তাঁর ইজতিহাদকৃত মতের অমিল রয়েছে। একই রকম ব্যাপার পরবর্তি যুগের আলিমদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে এবং মতভেদের সূচনা হয়েছে।

বুখারী এবং মুসলিমের একটা বর্ণনার মধ্যে এসেছে , উমর (রাযি) তিনি মনে করতেন যে , জুনুবী অবস্থায় (অর্থাৎ যার গোসল ফরয হয়েছে) সে যদি গোসলের জন্য পানি নাও পায় , তাহলে তায়াম্মুম দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে না। তখন আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাযি) তাকে একটা ঘটনা বললেন যে , তিনি একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সফর সঙ্গী ছিলাম , আমার গোসলের জরুরত হলো কিন্তু পানি পাওয়া গেল না। তাই তায়াম্মুমের উদ্দেশ্যে ধুলায় গড়াগড়ি করে নিলাম। পরে ঘটনাটি আল্লাহ্ 'র রাসূল ﷺ জানালাম এবং তিনি বললেন , তোমার এতোটুকু করাই যথেষ্ট ছিল। তখন তিনি নিজের দু 'হাত জমিনে মারলেন এবং সেখান থেকে উঠিয়ে স্বীয় মুখমন্ডল ও হাত বা পা মাসেহ করে দেখালেন অর্থাৎ তিনি তায়াম্মুম করে দেখালেন এবং বললেন যে এইটুকুই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল।

উমর (রাযি) এর দৃষ্টিতে আম্মার (রাযি) এর বর্ণনায় কোনো না কোনো দুর্বলতা ছিল , এজন্য তিনি এটাকে গ্রহণ করেননি। কিন্তু বাস্তবে আম্মার (রাযি) এর এই বর্ণনাটা একদম সহীহ হাদিস এবং পরবর্তীতে উলামায়ে কেরাম এটার উপরেই মত দিয়েছেন।

• চতুর্থ কারণঃ
ভুলে যাবার কারণে মত পার্থক্য।

একজন সাহাবী পুরো অংশ হাদিস বর্ণনা করেছেন। আরেকজন সাহাবী প্রথম অংশটা ভুলে গিয়েছেন , পরের অংশটা বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে দুইজনের কিছুটা ভুলে যাওয়া থেকে বর্ণনা দুইরকম হয়ে যায় । যেমনঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার বলছেন , রসুলুল্লাহ ﷺ একবার রজব মাসে উমরাহ করেছিলেন। কিন্তু এই কথা শুনে আয়েশা (রাযি) বললেন , ইবনে উমার ব্যাপারটা ভুলে গেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল ﷺ কখনও রজব মাসে উমরাহ করেননি। তাহলে মানবীয় ভুলে যাওয়ার কারণেও মত পার্থক্য হয়।

• পঞ্চম কারণঃ
আল্লাহ্' র রসূলের মন্তব্যের সঠিক উদ্দেশ্য ও সঠিক মাকসাদকে ধরতে না পারা। আল্লাহ্ 'র রাসূল কেন কোনো একটি কাজের কথা বললেন , তা বুঝতে না পারার কারণেও মতভেদ হয় । যেমন- একদিন রাসূল সাঃ একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই কবরের পাশে লোকেরা মাতম করছিল। রাসূল সাঃ বললেন , "তারা মাতম করছে অথচ কবরে তাকে আযাব দেওয়া হচ্ছে "। এই কথা শুনে পরে একসময় আব্দুল্লাহ ইবনে উমার বলেছিলেন, "জীবিত ব্যক্তিদের আহাজারির কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবরের আযাব দেয়া হয় ।" একথা শুনে আয়েশা (রাযি) বললেন , তোমরা কি কুরআনের ঐ আয়াতটা পড়োনি যেখানে বলা হয়েছে , কিয়ামতের দিন কেউ কারো বোঝা বহন করবে না ?। আয়েশা (রাযি) স্পষ্ট বললেন , "ইবনে উমার তোমাদেরকে ভুল বলেছেন "। অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তিদের মাতমের কারণে নয় বরং ঐ মৃত ব্যক্তির কর্মে রজন্যই আযাব দেওয়া হচ্ছিল-যার ব্যাপারে রাসূল সাঃ ঐকথা বলেছিলেন।

• ষষ্ঠ কারণঃ কোনো একটা বিধান নির্ণয় করার পিছনে কি কারণ ছিল , তা নির্ণয়ে মতভেদের কারণেও মতভেদ হয়েছে।

যেমনঃ একটা মুসলিমের সামনে দিয়ে যদি একটা মৃত ব্যক্তির কফিন যায় , তাহলে সেই মুসলিম কি দাঁড়াবে নাকি দাঁড়াবে না অথবা যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে? কী করবে? এটা নিয়ে তিনটা মত আছে।
একদল সাহাবী বলছেন, যেহেতু প্রতিটা লাশের সাথে ফেরেশতারা সামিল হয়, তাই মৃত ব্যক্তি মুমিন হোক বা কাফের হোক , ফেরেশতারা সামিল হবে। লাশ মুমিনের হোক বা কাফেরের হোক , মুমিনকে দাঁড়াতে হবে ফেরেশতাদের সম্মান দেখিয়ে । আবার আরেকদল সাহাবী বলছেন , এই দাড়ানোটা আল্লাহ 'র রাসূল মৃত্যু ভীতির কারণে দাড়িয়ে ছিলেন। মৃত্যুকে স্মরণ করে তিনি দাঁড়িয়েছেন। এজন্য যেকোনো লোকের লাশ গেলে দাঁড়াতে হবে, হোক সে মুসলমান বা কাফের।
আবার কোনো কোনো সাহাবী বলেছেন যে , একবার রসূলুল্লাহ 'র কাছে দিয়ে একজন ইহুদির লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং আল্লাহ্ 'র রাসূল বসে ছিলেন। ইহুদির লাশটা মানুষের ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ'র রাসূল চাননি যে তার উপর দিয়ে কোনো ইহুদির লাশ যাক। এজন্য তিনি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। এটা যদি সঠিক কারণ হয়, তাহলে দাঁড়ানোটা কেবল কাফির বা অমুসলিমদের লাশের জন্য নির্দিষ্ট।

• **সপ্তম কারণঃ**
সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে কিংবা কোনো বিষয়ের বৈপরীত্য সমাধান করতে গিয়ে নতুন আরেকটা মতের সূচনা হয়ে গিয়েছে। যেমনঃ খায়বার যুদ্ধের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ সাময়িক বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর এটা নিষেধ করে দিয়েছিলেন। এজন্য ইবনে আব্বাসের মত হচ্ছে , মুতাআ বিয়েটা প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত। যখন প্রয়োজন থাকবে এটা অব্যাহত থাকবে।

কিন্তু আহলুস সুন্নাহ এর প্রধান মত হলো যে , এটা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। এভাবে সামঞ্জস্য করতে গিয়ে দেয় যায় একাধিক মতের সূচনা হয়েছে।

তাকলীদ কিভাবে আসলো এবং এর গুরুত্বঃ

১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে যখন আব্বাসী খেলাফতের পতন হয়ে গেল , তখন আলেমরা সমস্ত ধরনের ইজতিহাদ বন্ধ করে দিলেন। তখন তারা বললেন, উম্মাহ'র সকল সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সমাধান বের করা হয়ে গেছে। তাই এখন আর কোনো ইজতিহাদের প্রয়োজন নেই। এজন্য কেউ যদি কোনো বিধানকে মানতে চায় তাহলে তাকে চার মাযহাবের যেকোন একটা মাযহাব অবশ্যই মানতে হবে।

এর ফলশ্রুতিতে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নতুন ইজতিহাদ ও গবেষণা একরকম বন্ধ ছিল এবং ইসলামিক স্কলারশিপ একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। আব্বাসী খেলাফতের পর মুসলিম রাষ্ট্র অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ইমামগণ , সমকালীন আলিমগণ ও তাঁদের ছাত্রগণ বিভিন্ন দেশে এবং অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সেসব অঞ্চলে তাঁদের মত (মাযহাব) সুপ্রসিদ্ধ হয়ে যায় । এজন্য একেক রাষ্ট্র একেক মাযহাবের স্কলারদের অনুসরণ করতে শুরু করে। যেমন- ভারতীয় উপমহাদেশে হানাফি মাযহাব বিখ্যাত হয়ে যায় । আফ্রিকা মহাদেশে মালেকি মাযহাব, আবার ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ায় শাফেয়ী মাযহাব রাষ্ট্রীয় ভাবে জনপ্রিয়তা পায় এবং মধ্য প্রাচ্যে হাম্বলী মাযহাব রাষ্ট্রীয় ভাবে খ্যাতি অর্জন করে। তাই একেক জায়গায় একেক মাযহাব কেন্দ্রিক ফিক্বহ গড়ে ওঠে এবং ঐ অঞ্চলের মানুষজন ঐ মাযহাবকেই তাকলীদ করতে শুরু করে।

ঐ সময়ে কিছু মানুষ নিজেরদের জ্ঞান জাহির করার উদ্দেশ্যে এবং দুনিয়াবী লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়াই মাসআলা বের করা শুরু করেছিল। এজন্য আলিমগণ শরীয়াকে বিকৃত ইজতিহাদের হাত থেকে এবং বিকৃত ধর্ম ব্যবসায়ী ভন্ডদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ইজতিহাদের দরজাকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এটাও ছিল তখন ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে যাওয়ার একটি অন্যতম কারণ।
মতভেদপূর্ণ বিষয়ে আমাদের করণীয়ঃ

মতভেদপূর্ণ বিষয়ে আমাদের করণীয় দুইটি হতে পারে
১/ নিজেরা ইজতিহাদ করা।
২/ কোন একটি মাজহাব অনুসরণ করা অথবা সমকালীন সময়ের নির্ভরযোগ্য ও মুত্তাকি আলিমদের অনুসরণ করা।

তাই মতভেদপূর্ণ বিষয়ে হয় নিজেকে গবেষণা করে বের করতে হবে অথবা যারা গবেষণা করে গেছেন তাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু নিজে ইজতিহাদ করতে হলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। অন্যথা ইজতিহাদের নামে ফিতনা তৈরী হবে ও মানুষ বিভ্রান্ত হবে।

ইজতিহাদ করার যোগ্যতা এবং বৈশিষ্ট্যঃ

ইমাম নববী (রহ.) আল মিনহাজ গ্রন্থের মধ্যে মুজতাহিদের যে জ্ঞান গুলো দরকারতা তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

১. যিনি কিতাব ও সুন্নাহ'র বিধান সংক্রান্ত আয়াতগুলোর উপরে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী , তাছাড়া ঐসব বিধানের খাস আম, মুজমাল মুবাইয়ান, নাসিখ মানসুখ ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন।
২. যিনি বর্ণনাগত দিক থেকে হাদিসের মুতাওয়াতির , ওয়াহেদ, মুত্তাসিল মুরসাল ইত্যাদি হওয়ার অবস্থা এবং শক্তিশালী ও দুর্বল রাবীদের সম্পর্কে শক্ত জ্ঞান রাখেন।
৩. ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ উভয় দিক থেকে আরবি ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য রাখেন।
৪. যিনি সাহাবী ও তাবেঈ আলেমগণের ব্যাপারে এই খবর রাখেন যে , তারা কোন কোন মাসআলার ক্ষেত্রে একমত পোষণ করতেন আর কোন কোন মাসআলার ক্ষেত্রে তাদের মতবাদের পার্থক্য ছিল।
৫. যিনি কিয়াসের তাৎপর্য ও তার সকল প্রকারভেদ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

এই গুণ বা বৈশিষ্ট্য অবশ্যই একজন মুজতাহিদের থাকতে হবে ব্যক্তিগত ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে। যাদের এই সকল বৈশিষ্ট্য গুলো নেই তাদের ব্যাপারে শাইখ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলাউই তার কিতাবের মধ্যে লিখেছেন, “যারা মাসায়েল যাচাই বাছাই করার মতো দ্বীনের জ্ঞানের অধিকারী নয়, তাদের উচিত প্রচলিত যাবতীয় বিষয়ে নিজেদের পূর্বপুরুষ (হকপন্থী উলামা) ও স্থানীয় (নেককার, জ্ঞানী এবং সুন্নাহর পাবন্দী মুসলমানদের অনুসরণ করা। আর যখন কোনো নতুন বিষয় তাদের সামনে আসবে, সেই বিষয়ে নিষ্ঠাবান মুফতিগণের নিকটে ফতোয়া চাওয়া আর মামলা মুকদ্দমার ক্ষেত্রে কাজীগণের ফয়সালা অনুসরণ করা। এটাই তাদের জন্য সরল সঠিক ও উত্তম পথ।"

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) এর একটা উক্তিতে আছে, তিনি বলেছেন, কারো নিকট যদি এমন কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়, যেটার বিষয়ে স্বীকৃত ইমামগণ একমত পোষণ করেন, সেটার সেই সর্বসম্মত জবাবটি বলে দেয়াতে কোনো সমস্যা নাই। কারণ এটা তার নিজস্ব মত নয়, বরং ইমাম মুজতাহিদগণ এর মতেরই ভাষ্য বলে গণ্য হবে।

ফক্বীহদের মধ্যে যে পারস্পরিক মত পার্থক্য, এই মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে গৌণ বিষয়ে, ইফতিলাফ হয়েছে গৌণ বিষয়ে মূখ্য কোনো বিষয়ে না, দ্বীনের প্রাথমিক / মৌলিক বিষয়ে না। আল্লাহ্'র সিফাত নিয়ে বিতর্ক হয়নি। সিফাতের ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। ওযু, নামাজের আহকাম নিয়ে বিতর্ক হয়েছে কিন্তু আল্লাহ্'র একত্ব নিয়ে কোনো বিতর্ক হয়নি। জান্নাত, জাহান্নাম নিয়ে কোন বিতর্ক হয়নি। শরীয়তের আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিতর্ক হয়েছে কিন্তু সরাসরি শরীয়তের বিষয়ে কোন বিতর্ক হয়নি।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেছেন, “সাহাবায়ে কেরামের পরেই এমন সব লোকের আগমন ঘটে, যারা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়ার কারণে হিংসা, বিদ্বেষ ও বিবাদের ঝড় বইয়ে দেয়। ইখতিলাফি বিষয়গুলোর কোনো একটিকে আঁকড়ে ধরে এবং এই মতের অধিকারীদের একপক্ষ এবং ঐ পক্ষের অধিকারীদের আরেক পক্ষ হিসেবে ভাবতে থাকে। এভাবেই শুরু হয় ফিরকার প্রসার। এভাবেই মানুষের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হতে থাকে তাহকীক ও চিন্তা-গবেষণার জজবা, তারা নিজ নিজ ইমামের মাজহাবকে আঁকড়ে ধরে অন্ধ ভাবে। আফসোস তাদের এই অবস্থানের জন্য অথচ এই সব মত পার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে সাহাবী, তাবেঈ ও তাদের পরবর্তী আলেমগণের অবস্থান দেখো, তারা নামাজে কেউ বিসমিল্লাহ পড়তেন আবার কেউ পড়তেন না, কেউ সশব্দে পড়তেন কেউ নিরবে পড়তেন, কেউ ফজরে দু'আ কুনুত পড়তেন কেউ পড়তেন না, কেউ স্ত্রী স্পর্শ করলে ওযু করতেন কেউ করতেন না, কেউ রান্না করা খাদ্য খেয়ে ওযু করতেন কেউ করতেন না, কেউ উটের গোস্ত গেলে ওযু করতেন কেউ করতেন না। অর্থাৎ এতো বিষয়ে মতভেদ থাকার পরও তারা একজন আরেকজনের পিছনে নামাজ পড়তেন"। যেমনঃ ইমাম আবু হানিফা ও তার সাথীরা এবং ইমাম শাফেয়ী মদিনার ইমামদের পিছনে নামাজ পড়তেন। অথচ তারা ছিলেন মালেকী ও অন্যান্য মতের লোক যারা সশব্দে বা নিঃশব্দেও বিসমিল্লাহ পড়তেন না। ইমাম আবু ইউসুফ হারুনুর রশিদের পিছনে নামাজ পড়েছেন অথচ হারুনুর রশিদ খৌরকার্য করার পর নতুন করে ওযু করতেন না। কারণ ইমাম মালিক ফতোয়া দিয়েছেন, খৌরকার্য করার পর ওযু করার প্রয়োজন নেই। এমনটাই ছিল তাঁদের সহনশীলতার নমুনা।”

পূর্ববর্তী প্রজন্মের ফিক্বহ বিষয়ের গবেষনাকে কেন্দ্র করে সমকালীন আলেমদের গবেষণা চলবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ হিসেবে যাদের কুরআন এবং হাদিস পড়ে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা নেই, আমাদের উচিত হবে কোনো একজন ইমামকে অথবা কোন একজন স্কলারকে অনুসরণ করবো।

তবে যেসকল আলেমদের আমরা অনুসরণ করবো, তাদের ব্যাপারে যদি এরকম চিন্তা করি যে, তারা যে ইজতিহাদ দিয়েছে তা ঐশী মতামত এবং তাদের এটা ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, আল্লাহ্ এটা তার উপর ওহী করে পাঠিয়েছে। তাহলে এটা সত্যিকার তাকলীদ না। এই ধরনের চিন্তা ভাবনা তখন হারাম হয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর মাধ্যমে ওহী পাঠানোর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

সুতরাং আমরা যে স্কলারকে বা আলেমকে অনুসরণ করবো সেটা তাঁর ইজতিহাদি মত ধরে নিয়ে করব। সেই আলেমের নিয়ত বিশুদ্ধ থাকায় সে ভুল মত দিলেও সে একটি সওয়াব পেয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের যেহেতু ইজতিহাদ করার যোগ্যতা নাই তাই আমরা কোনোভাবেই মত প্রদান করবো না। এক্ষেত্রে আমরা ইজতিহাদ করে ভুল মত দিলে কোনো সওয়াব তো পাবোই না বরং আমরা গুনাহগার হবে। কারণ এর দ্বারা অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হবে।

তাই আমরা কোনো একটি মাযহাবকে অথবা সমকালীণ আলিমগণের মধ্যে থেকে নির্ভরযোগ্য ও মুত্তাকি এবং ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখেন এমন ‘আলিমগণকে অনুসরণ করবো আমাদের নিরাপত্তার জন্য। একইসাথে মতভেদপূর্ণ মাস'আলায় আমাদের অন্তরকে প্রসারিত করবো। বিপরীত মতকে সহ্য করার মত মন মানসিকতা আমাদেরকে রাখতে হবে। কারণ, সেই মতটিও কোনো না কোনো আলিমের ইজতিহাদের ফল এবং তার পেছনেও রয়েছে শরীয়তের দলীল। হয়ত আমরা সেই দলীলটি জানিনা বলে আমাদের কাছে তা দূর্বল বা অগ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে। বর্তমান সময়ে অনেককে বলতে শোনা যায়, তাঁরা নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব মানেন না, তাঁরা সমকালীন আলিমদের থেকে কুরআন ও সুন্নাহ এর আলোকে মাসআলা জেনে

নেন। এই সকল ভাই-বোনদের প্রতিও আমরা সমান শ্রদ্ধা সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রাখব। কারণ, তাঁরা তো 'আলিমদের মতই অনুসরণ করছেন। যোগ্যতা ছাড়াই নিজেরাতো ইজতিহাদ করছেন না। তাই তাঁরাও আমাদের দ্বীনি ভাই, আমাদের দ্বীনি বোন। আমরা এক উম্মাহ এবং এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় ।